উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের আলোকে দাম্পত্য-সমস্যা রূপায়ণের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হয়ে আমরা বর্তমান সন্দর্ভে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথমদিকের তিন মহারথীর উপন্যাস-কৃতি বিশ্লেষণের মধ্যেই আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছি। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের আলোকে কীভাবে দাম্পত্য-সমস্যার দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে এবং ফুটে উঠেছে তাই আমাদের প্রধান অণ্বিষ্ট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনঃসমীক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সবই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত ('The Interpretaton of Dreams- 1900' এবং 'Psycho-Pathology of Everyday Life- 1904') হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলি (দাম্পত্য-সমস্যা কেন্দ্রিক) প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাই বঙ্কিম উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতিফলন খুঁজতে গেলে তা কালাতিক্রমণের দোষে অভিযুক্ত হতে পারে। বঙ্কিমের পক্ষে ফ্রয়েডের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না ঐতিহাসিক কারণেই। অনুমান করি, 'চোখের বালি' (১৯০৩) লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এই তত্ত্বের গভীরে অবগাহন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) বা 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের রচনাকালে এই সমস্যা ছিল না। তাই 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে যে দাম্পত্য সমস্যাকে মনস্তত্ত্বের আলোকে দেখার সম্ভাবনা মাত্র সূচিত হয়েছিল, 'চোখের বলি'-র পথ ধরে তার পূর্ণবিকশিত ও সমুন্নত রূপ দেখা গেল 'যোগাযোগ' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে।

ফ্রয়েডের বিজ্ঞানভিত্তিক মনঃসমীক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণের প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বের সাথে পরিচিত না থাকলেও নর-নারীর, বিশেষতঃ দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব, আকাঙ্ক্ষার অবদমন ও তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণজাত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন, তা 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নিবিড় পাঠ থেকেই বোঝা যায়। যদিও বিধবাবিবাহের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে, এই সমস্যকে কেন্দ্রে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস দুটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্কট, অনণ্বয় ও ভাঙনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। সমালোচকদের বিচারে অবশ্য 'বিষবৃক্ষ'-এর তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উন্নততর ও অধিক শিল্পসার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু, আমাদের অন্বেষণ এবং বিশ্লষণের পটভূমিতে বলা যায়, ১৮৭৩- এ প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' দাম্পত্য সমস্যামূলক একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস।

কিন্তু, শুধু কী 'বিষবৃক্ষ' থেকেই প্রকৃত অর্থে দাম্পত্য সমস্যা উপস্থাপনের সূত্রপাত বাংলা উপন্যাসে ? তারও আগে, 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) তে, কী এই জাতীয় সমস্যার সূত্রপাত হয়নি ? যদিও এই উপন্যাসে ইতিহাসের ধূসর পটে রোমান্সের রঙীন প্রলেপ রয়েছে, তবুও

সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলার সপ্তগ্রামের এক যুবকের এক বছরের দাম্পত্যজীবনের শীতলতা ও তার মধ্যে ইতিহাস ও অলৌকিকতার অনুপ্রবেশকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি দিতে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও।

এরপরেই 'বিষবৃক্ষ'। বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে এখানে এক ত্রিকোণ প্রেমের আবহ রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি একথা সর্বজনবিদিত, তিনি মনে করেছিলেন যে, বিধবার পুনর্বিবাহ ঘটলে সমাজে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হবে। এই সামাজিক বক্তব্যকে সামনে রেখেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামোর পরিকল্পনা। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্যের মধ্যে হঠাৎই অসহায় সুন্দরী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব। ক্রমে নগেন্দ্রনাথের কুন্দ-আসক্তি তীব্র হয়ে উঠল এবং ত্রিকোণ প্রেমের তথা দাম্পত্য দুরত্ব ও জটিলতা গভীরতা অর্জন করল। বিধবাবিবাহের প্রশ্নটিকে দূরে সরিয়ে রাখলেও, এই অবৈধ সম্পর্কের ট্র্যাজিক পরিণতি ও শেষে অনেক মূল্য দিয়ে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর মধুর পুনর্মিলন ভারতীয় তথা হিন্দু দাম্পত্যের মাধুর্য ও অটুট স্থায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় আস্থার মনোভাবকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। কুন্দনন্দিনী তাঁদের সুখের সংসারে প্রবেশের পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর নিবিড় সম্পর্কের দেওয়ালে যে ফাটল দেখা দেয়-সেই ঘটনা-সূত্র থেকে শুরু করে কাহিনির পরিণতি পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মনোবিশ্লষণে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। (যদিও উদ্দশ্যমূলকতা কখনো কখনো এ উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিবন্ধক হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেন)। বলা চলে, 'কপালকুন্ডলা' থেকে 'বিষবৃক্ষ'-এ এসে দাম্পত্য সমস্যার মনোবিশ্লেষণে এক ধাপ অগ্রসর হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অগ্রসর হলো বাংলা উপন্যাস।

'বিষবৃক্ষ'-এর পরে, শিল্পগুণসমৃদ্ধ দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস হলো 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। বলা যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', পূর্ববর্তী 'বিষবৃক্ষ'-এর তুলনায় শিল্পগুণে উন্নততর উপন্যাস। যদিও, উভয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অভিমুখ এবং কাহিনি-কাঠামো প্রায় একই ধরনের। এর আগে রচিত দুটি উপন্যাসে--'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রজনী'তে (১৮৭৭) দাম্পত্য সমস্যার প্রসঙ্গ উকিঝুঁকি দিলেও তা মনোবিশ্লেষণে ও শিল্পগুণে 'বিষবৃক্ষ'-এর মতো সমৃদ্ধ নয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লেখকের একটি ঘোষিত বক্তব্য আছে, তা হলো বাল্যপ্রণয়ের অভিশপ্ত পরিণতি দেখনো। প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় অচরিতার্থ থেকে গিয়েছিল। তার বিবাহ হয় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার দীর্ঘ আট বছরের দাম্পত্যজীবনেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ পায়নি শৈবলিনী। এখান থেকেই তার চরিত্রে জটিলতার সূচনা এবং সেই জটিলতা অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে উপন্যাসের স্বাদ বৃদ্ধি করেছে। তবে, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে সমকালীন দেশকালের প্রভাব। তবুও সীমিত পরিসরে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর দাম্পত্য সমস্যা বর্ণনায় মনোবিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

সবদিক বিচারেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা উপন্যাসের একটি মাইলস্টোন। ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, কাহিনি বয়নের জটিলতার ক্ষেত্রে, উপন্যাসের আধারে ট্র্যাজিক সংবিদ সঞ্চারের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি মনস্তত্ত্বের আলোকে দাম্পত্য সমস্যা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই উপন্যাসটি পরবর্তী লেখকদের কাছে পথ প্রদর্শকের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। এই উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব এক চমৎকার প্রতীকী প্রয়োগ। তাছাড়াও, মনে রাখা প্রয়োজন যে, নগেন্দ্রনাথ (বিষবৃক্ষ) যেভাবে খুব সহজেই কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, যে আসক্তিকে বৈধতা দিতে নিজের জমিদারি ক্ষমতাও প্রয়োগ করেছেন, সেখানে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি তাঁর ক্রমজাগ্রত আসক্তি প্রতিহত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। গোবিন্দলালের আত্মদমনের প্রয়াস উপন্যাস-কাহিনিতে মনোবিশ্লষণের এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আবার, আভিমানবশত ভ্রমর পিত্রালয়ে চলে যাবার পর গোবিন্দলালের ক্রোধ এবং 'ভ্রমরকে একটু কাঁদাইব' ভেবে তাঁর ক্রমবর্ধমান জেদ তাঁকে ক্রমশ রোহিণীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই অংশে, লেখকের মতে গোবিন্দলালের দ্রুত অধঃপতনের অংশে গোাবিন্দলালের মনোবিশ্লেষণ আধুনিক ও বিশ্বাসযোগ্য। আবার, কলসী, বারুণী পুষ্করিণীর সঙ্গে, এমনকি একান্ত নিভৃতে রোহিণীর নিজের সঙ্গে কথোপকথনেও রোহিণীর মনোবিশ্লেষণ শৈল্পিক সার্থকতা অর্জন করেছে। রোহিণীর মনস্তত্ত্ব সবচেয়ে ভালো ফুটেছে হরলাল-সন্নিধানে। আর কিশোরী, অপরিণতমনস্কা ভ্রমরের ক্রমশ পরিণতবুদ্ধি নারী হয়ে ওঠার বিবর্তন এই উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সবচেয়ে শিল্পসার্থক দিক ! কাহিনির শেষে সন্ন্যাসীবেশে রিক্ত নিঃস্ব গোবিন্দলালের আবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরে আসার বর্ণনায় যে গাঢ় দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়, তা নতুন করে দাম্পত্যের মধুর নিবিড় বন্ধনের শাশ্বত প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমাদের বর্তমান অন্বেষণের ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি তাৎপর্যপুর্ণ দিকনির্দেশক উপন্যাস।

মনন ও চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় আধুনিকতার অগ্রপথিক। স্বভাবতই বঙ্কিম-যুগের নীতিবোধের পীড়া ও উদ্দেশ্যমূলকতা তাঁর উপন্যাস-ভাবনাকে প্রভাবিত করেনি। বিশেষ তত্ত্ব বা আদর্শের মোড়কে নয়, তিনি আধুনিক মানুষকে দেখতে চেয়েছিলেন তার ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতা দিয়ে। এই সমগ্রতা-সন্ধানী দৃষ্টিতেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বিনোদিনীকে, যে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর চেয়ে অনেকটাই আলাদা। যদিও বিবর্তনের ধারায় রোহিণীর পথেই বিনোদিনীর আবির্ভাব ! 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের সমকালে বাঙালি পাঠকের মনন ও প্রস্তুতি অনেকটাই বদলে গেছে। তাই উপন্যাসের নতুন অবলম্বন যে 'আঁতের কথা' অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, একথা রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'তেই স্বীকার করে নিলেন। মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য জীবনেও এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জাগ্রত চৈতন্য বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। অত্যন্ত নিবিড় প্রযত্নে দেখিয়েছেন মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য জীবনে কোথায় কোন গোপন ছিদ্র ছিল ! যে ছিদ্রপথে বিনোদিনীর অনুপ্রবেশ, মহেন্দ্র ও আশার ভঙ্গুর দাম্পত্য এবং শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ 'চোখের বালি' উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যাকে আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে লগ্ন করতে পেরেছে।

দাম্পত্য সমস্যা কেন্দ্রিক মনোবিশ্লেষণ-নির্ভর রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'যোগাযোগ'(১৯২৯) আমাদের আলোচ্য কালপর্বে, আদি যুগের তিন মহারথীর এ-জাতীয় যাবতীয় উপন্যাসের ধারায় 'যোগাযোগ' শ্রেষ্ঠতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও সামগ্রিক বিচারে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে অনেকেই 'খণ্ডিত' এবং অনুপযুক্ত ও আরোপিত উপসংহারের অভিযোগ করেছেন। ঘোষাল বংশের তিন প্রজন্মের কাহিনি বলবেন বলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রাথমিক নামকরণ করেছিলেন 'তিনপুরুষ'। পরবর্তীকালে, যেকোনো কারণেই, হোক এক প্রজন্মের (মধুসূদন ঘোষাল) কাহিনি বলেই যেন ঔপন্যাসিক ছুটি নিতে চেয়েছেন। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টি মানুষের চরিত্রগঠনে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা নেয় তা এই উপন্যাসে পরস্পর বিপরীতধর্মী রুচি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্বামী-স্ত্রীকে দেখলেই বোঝা যায়। মধুসূদন মুৎসুদ্দি-বানিয়ার স্থূল রুচির প্রতিনিধি, দেহকেন্দ্রিক ভোগই যার কাছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ! অন্যদিকে স্নিগ্ধ, সুন্দর, সূক্ষ্ম রুচিবোধ সম্পন্না কুমুদিনী বরাবরই আদর্শ ও মননকে স্থান দিয়েছে দেহের ওপরে। ফলে এদের দুজনের মধ্যে সংঘাত অনিবার্যই ছিল।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘ্যত ও দুরত্বের চিত্র ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে 'স্ত্রীর পত্র', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি গল্পে। যাই হোক, দাদা বিপ্রদাসের আদর্শে উজ্জীবিত কুমুদিনী আশা করেছিল তার বিদ্রোহিনী সত্তা যথোচিত পারিবারিক ও সামাজিক সমর্থন পাবে, কিন্তু কুমুদিনীর সন্তান-সম্ভাবনা যাবতীয় বিতর্ক বা বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। যে কুমুদিনী দাম্পত্য সম্পর্কের অনন্বয়ের সমাধান খুঁজেছিল বিদ্রোহাত্মক গৃহত্যাগের পথে, সেই কুমুদিনীকেই শেষ পর্যন্ত ভাবী সন্তানের পিতৃপরিচয়ের তাগিদে আবার ফিরে আসতে হলো স্বামীগৃহে ! কুমুর এই প্রত্যাবর্তন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এই জন্য 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিণতি যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দাম্পত্য সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় 'যোগাযোগ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, হয়তো বা সার্থকতম সৃষ্টি !

'যোগাযোগ' উপন্যাসের আগে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিখিলেশ ও বিমলার মধুর দাম্পত্যের মধ্যে শনিগ্রহের মতো ঢুকে পড়েছিল সন্দীপ। সাময়িকভাবে বিমলা সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়, মোহমুক্ত হতেও বেশি সময় লাগেনি ! কিন্তু সন্দীপের প্রবেশের পর এদের দাম্পত্য জীবনে যে অস্থিরতা ও সঙ্কট দেখ দেয়, তা মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আত্মকথন রীতির বর্ণনাভঙ্গি লেখককে এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। তবে, দাম্পত্য সমস্যা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের একমাত্র ও একক বিষয় নয়। ঘর ও বাহির তথা সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন স্বদেশী রাজনীতির প্রলেপ এই উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যার বিষয়টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলতেই হবে। একই কথা প্রযোজ্য 'মালঞ্চ' উপন্যাস প্রসঙ্গেও। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় 'দুই নারী' তত্ত্বের উপস্থাপন এ উপন্যাসেরও শিল্পগুণকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে বলতে হবে। তবে, 'মালঞ্চ' উপন্যাসে অসুস্থ নীরজার মনস্তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার চিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ আরও আধুনিক স্তরে উত্তীর্ণ হবে এমনটাই ছিল পাঠকদের প্রত্যাশা। কিন্তু এক্ষেত্রে, কিরণময়ী ও কমলের চরিত্র ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, শরৎচন্দ্র কোনো অগ্রসর মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র সামাজিক বর্ণভেদ, গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের বাস্তবতা, নারীর সামাজিক অবদমন ইত্যাদি ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই মনোবিশ্লেষণে যথোচিত প্রযত্ন দেখাতে পারেননি। 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাস দুটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তবুও বলতে হবে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসটির কাহিনি-গ্রন্থন আকস্মিকতা, অবিশ্বাস্যতা ও নাটকীয়তায় ভরপুর। তাছাড়া এ উপন্যাসের নায়িকা অচলার দোলাচলচিত্ততা এক অপরিণত নারীর 'মূঢ়তা'র দায়ে অভিযুক্ত। তবে, 'ঘরে-বাইরে' বা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের তুলনায় শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রে সাহসী নিরীক্ষাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলা মোহগ্রস্ত হয়েও অমূল্যর অদৃশ্য প্রেরণায় দ্রুত মোহমুক্তির পথে ফিরে এসেছে, স্বামী চরিত্রহীন জেনেও কুমুদিনী কোনো মূল্যেই বিপথগামিনী হয়নি। কিন্তু, অচলা মুহূর্তের ভ্রান্তিতে, স্বামীর বন্ধু সুরেশের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে। তারপরে অবশ্য অচলার পরম সম্পদ হারানোর শোচনীয় অনুভূতি হয়েছে ! কিন্তু এই দেহমিলনও ঘটনাধারার অনিবার্য পরম্পরায় নয়, দ্রুত আকস্মিকতায় সংঘঠিত হয়েছে। ফলে দাম্পত্য সমস্যার সাহসী উপস্থাপন থাকলেও 'গৃহদাহ'কে শিল্পসার্থক উপন্যাস বলা যায় না। তুলনায় 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে অভিযোগ কম, কিরণময়ীর চারিত্রিক অবস্থান নৈতিক দিক থেকে নয়, যৌক্তিক দিক থেকে অনেকের কাছে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়েছে। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের দ্বিতীয় দাম্পত্যকে কিছুটা 'লিভ টুগেদার'-এর গোত্রভুক্ত করে শরৎচন্দ্র আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কমলের উত্থাপিত প্রশ্নগুলিও অকাট্য। কিন্তু প্রশ্নে যুক্তিতে উপস্থাপনায় যথেষ্ট আধুনিক হলেও শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' শেষ বিচারে তত্ত্বভারাক্রান্ত উপন্যাস।

আমাদের আলোচ্য পরিধির মধ্যে দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাসের ধারায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গৃহদাহ' এবং 'যোগাযোগ'কেই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস বলা যায়। চরিত্রহীন বা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে সাহসী পদক্ষেপ থাকলেও মনোবিশ্লেষণের গভীরতা, সূক্ষ্মতা এবং শিল্পসম্মত যৌক্তিক পারম্পর্য কিছুটা উপেক্ষিতই বলা যায়। পরিকল্পনার ত্রুটি, আবেগ-বাহুল্য এবং অন্য নানা রূপ অসঙ্গতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে রাবীন্দ্রিক শিল্পোৎকর্ষে পৌঁছুতে দেয়নি।